নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনে বিতর্ক এড়াতে আইন প্রণয়ন জরুরি

ড. বদিউল আরম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন–সুমাসনের জন্য নাগরিক (১২ জানুয়ারি ২০১৭)

আমাদের সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের এখতিয়ার রাষ্টপতির। তবে এই নিয়োগ হতে হবে 'উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে'। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সংবিধান রচনার ৪৬ বছর পরেও এমন একটি আইন কোনো সরকারই প্রণয়ন করেনি, যার ফলে আমাদের সংবিধান বারবার লংঘিত হয়েছে। তাই সংবিধান নির্দেশিত এ আইনটি প্রণয়ন করা আজ জরুরি হয়ে পড়েছে, কারণ আইন প্রণয়ন না করে আবারও নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হলে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়াতে এবং জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া, যেহেতু সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর কারণে আগামী সাধারণ নির্বাচনও দলীয় সরকারের অধীনে হবে বলেই মনে হয়, তাই যথাযথ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি শক্তিশালী, নিরপেক্ষ ও মেরুদন্ড সম্পন্ন নির্বাচন কমিশন নিয়োগ করা আজ অতি আবশ্যক হয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গত, আমাদের প্রতিবেশী সার্কভুক্ত দেশগুলোর প্রায় সবগুলোতেই নির্বাচন কমিশনে নিয়োগের আইন রয়েছে।

ড. এটিএম শামসুল হুদার নেতৃত্বে গঠিত নির্বাচন কমিশন ***প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার (নিয়োগ পদ্ধতি) আইন, ২০১১*** শিরোনামে একটি আইনের খসড়া রেখে গিয়েছিল, যা নিয়ে বর্তমান রকিবউদ্দিন কমিশন কোনোরূপ পদক্ষেপই নেয়নি। সরকারের পক্ষ থেকেও এ ব্যাপারে কোনোরূপ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাই বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছি। আজকের আলোচনার উদ্দেশ্য হলো হুদা কমিশনের প্রস্তাবিত আইনটি নিয়ে আলোচনা, যাতে এর ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলো চিহ্নিত করা যায়। একইসঙ্গে এতে আর কী কী সংযোজন এবং বিয়োজন করা প্রয়োজন তা তুলে ধরা যায়।

আইনের অনপুস্থিতে আমাদের দেশে অতীতে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের সরাসরি নিয়োগে দিতেন। প্রসঙ্গত, আমাদের সাংবিধানের ৪৩(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতির নিয়োগ ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে কাজ করতে হয়। তাই আমাদের দেশে নির্বাচন কমিশনসহ অন্যসব নিয়োগ কার্যত প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তেই হয়ে থাকে।

মূলত প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগের কারণে অতীতের প্রায় সব নির্বাচন কমিশন নিয়েই অল্প বিস্তর বিতর্ক ছিল। ১৯৯৬ সালে একতরফা নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাদেক কমিশন ও রকিবউদ্দিন কমিশন এবং ভোটার তালিকা নিয়ে জটিলতার কারণে আজিজ কমিশন সম্ভবত সর্বাধিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। আর বিতর্কের ফলে অনেক কমিশনকে মেয়াদ শেষ হবার আগেই পদত্যাগ করতে হয়েছে। এমনকি কয়েকটি কমিশনকে অমর্যদার সঙ্গেও বিদায় নিতে হয়েছে। এসব বিতর্কের মূল কারণ হলো নিয়োগ পদ্ধতির অস্বচ্ছতা ও ত্রুটি, যার ফলে অতীতে অনেক ক্ষেত্রে অনাকাঙ্খিত ও পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তিদের কমিশনে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

চলমান বিতর্কের কারণে ২০১১ সালে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ২৩টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ করেন এবং নির্বাচন কমিশনে নিয়োগে অস্পষ্টতা দূরীকরনের লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন অথবা প্রজ্ঞাপন জারির সুপারিশ করেন। পরবর্তীতে মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে একটি অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশে জনাব কাজী রকিবউদ্দিনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বর্তমান নির্বাচন কমিশনকে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে নিয়োগ দেওয়া হয়। সেই অনুসন্ধান কমিটির সদস্য ছিলেন প্রধান বিচারপতি মনোনীত আপিল বিভাগের বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হেসেন ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মোঃ নূরুজ্জামান এবং মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক জনাব আহমেদ আতাউল হাকিম এবং সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান এটিএম আহমেদুল হক চৌধুরী। উল্লেখ্য, অনুসন্ধান কমিটির সদস্যদের কারো কারো বিরুদ্ধে দলপ্রীতির অভিযোগ উঠেছিল। আরও উল্লেখ্য, রকিবউদ্দিন কমিশনই হলো প্রথমবারের মত পাঁচ সদস্যের কমিশন – আগের সব কমিশনই ছিলো তিন সদস্য বিশিষ্ট।

সার্কভুক্ত দেশসমূহে বিরাজমান নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ পদ্ধতি

ভারত: ভারতীয় সংবিধানের নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ সংক্রান্ত বিধান অনেকটা বাংলাদেশের মতই। ভারতীয় সংবিধানের ৩২৪(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি সংসদ কর্তৃক পাশ করা আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদান করেন। ১৯৯৩ সালের আগে ভারতের নির্বাচন কমিশন এক সদস্য বিশিষ্ট হলেও পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির আদেশে তা তিন সদস্য বিশিষ্ট করা হয়। এছাড়াও ভারতে বাংলাদেশের মতই নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদানের কোনো আইন নেই। তবে প্রথাগতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সচিব বা সচিব বা সমমর্যাদা সম্পন্ন বর্তমান অথবা সাবেক জেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তাদেরকে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনে ছয়

বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের মত ভারতীয় নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ নিয়ে তেমন কোনো বিতর্ক সৃষ্টি হয়নি, অন্তত সাম্প্রতিক বছরগুলোতে।

ভারতীয় নির্বাচন কমিশনে নিয়োগের জন্য নামের প্রাথমিক তালিকা আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রস্তুত করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরণ করে, যা চূড়ান্ত করে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করেন। ভারতীয় প্রথা অনুযায়ী, কমিশনের কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার খাতিরে মেয়াদোত্তীর্ন নির্বাচন কমিশনারদের মধ্য থেকে জেষ্ঠ কমিশনারকে পরবর্তী মেয়াদের জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

প্রসঙ্গত, ১৯৯০ সালে 'গোস্বামী কমিটি' লোকসভার বিরাধী দলের নেতা ও প্রধান বিচারপতির সুপারিশে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ দেওয়ার প্রস্তাব করে। অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পরামর্শ গ্রহণের বিধানও গোস্বামী কমিটির সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গোস্বামী কমিটির সুপারিশের পর একই সালের ৩০ মে ভারতীয় সংবিধানের ৭০তম সংশোধনী রাজ্যসভায় উত্থাপন করা হয়। সংশোধনীতে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান, লোকসভার স্পিকার ও লোকসভার বিরোধী দলের নেতা (অথবা সর্ববৃহৎ দলের নেতার) পরামর্শে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আরও অন্তর্ভুক্ত করা হয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাচন কমিশনারেরও পরামর্শ গ্রহণের। কিন্তু ১৯৯৪ সালের ১৩ জুন সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাবটি রাজ্যসভা থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, ফলে গোস্বামী কমিটির সুপারিশ অবাস্তবায়িতই থেকে যায়।

পাকিস্তান: গত ২০১০ সাল থেকে পাকিস্তানের সংবিধানে অনেকগুলো যুগান্তকারী সংশোধনী আনা হয়েছে, যা নির্বাচন কমিশনের নিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। এছাড়াও নির্বাচন কমিশনে নিয়োগের লক্ষ্যে ***দি ইলেকশান কমিশন অর্ডার, ২০০২*** শিরোনামে একটি আইন পাকিস্তানে বিরাজমান। বিদ্যমান সাংবিধানিক ও আইনী বিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী, সংসদের বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে পরামর্শ সাপেক্ষে, শুনানী ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে একজনের অনুমোদনের লক্ষ্যে, তিনটি নাম স্পিকার কর্তৃক গঠিত ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংসদীয় কমিটির কাছে প্রেরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতা তিনজনের নাম সম্পর্কে ঐক্যমত্যে পৌছতে না পারলে, তারা প্রত্যেকে তিনজনের নামের তালিকা সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠান, যে তালিকা থেকে কমিটি প্রধান কমিশনার হিসেবে একজনের নাম চূড়ান্ত করেন।

সরকারি দলের ৫০ শতাংশ এবং সংসদে আসন সংখ্যার অনুপাতে বিরোধী দলসমূহ থেকে, সংশ্লিষ্ট সংসদীয় দলের নেতা কর্তৃক মনোনীত, বাকী ৫০ শতাংশ সদস্য নিয়ে স্পিকার সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটি গঠন করবেন। বার সদস্যের এই বিশেষ সংসদীয় কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সিনেটের সদস্য। এটি সুস্পষ্ট যে, সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন নিয়োগে পাকিস্তানে সংসদের ভুমিকাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশন গঠিত হয় একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য চারজন সদস্য নিয়ে, যাদের সবাই আসেন সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্য থেকে এবং যাদের মেয়াদ থাকে তিন বছর। প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে একটি সংসদীয় কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হলেও, অন্যান্য কমিশনারদেরকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্য থেকে সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে।

শ্রীলংকা: শ্রীলংকায় স্পিকারের নেতৃত্বে গঠিত ১০ জনের একটি কন্সটিটিউশন্যাল কাউন্সিলের সুপারিশে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দেওয়া হয়। কাউন্সিলের সদস্য হলেন প্রধানমন্ত্রী, সংসদে বিরোধী দলের নেতা, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মননোনীত একজন সংসদ সদস্য, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত আরও পাঁচজন সংসদ সদস্য, যার মধ্যে দুইজন মনোনীত হন প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে, দুইজন সংসদে বিরোধী দলের নেতার সুপারিশে এবং আরেকজন সংসদ সদস্য যিনি প্রধানমন্ত্রী ও সংসদের বিরোধী দলের নেতা যে দল থেকে নির্বাচিত তার বাইরের কোনো দল থেকে সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত।

নেপাল: সম্প্রতি নেপালে একটি নতুন সংবিধান প্রণীত হয়েছে। নতুন সংবিধান অনুযায়ী, নেপালে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত কন্সটিটিউশন্যাল কাউন্সিলের সুপারিশে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ প্রদান করেন। কনাসটিটিউশন্যাল কাউন্সিলের সদস্য হলেন প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, সংসদের উভয় কক্ষের স্পিকার, সংসদের বিরোধী দলের নেতা এবং প্রতিনিধি পরিষদের ডেপুটি স্পিকার।

ভুটান: ভুটানে রাজা নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, স্পিকার, সংসদ নেতা ও সংসদের বিরোধী দলের নেতা কর্তৃক সুপারিশকৃত নাম থেকে এ নিয়োগ দেন। ভুটানে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্য দুজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে পাঁচ বছরের মেয়াদে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়ে থাকে।

মালদ্বীপ: মালদ্বীপে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ পদ্ধতি কিছুটা ব্যতিক্রমী। ২০০৮ সালে প্রণীত ***ইলেকশান কমিশন আইনের*** অধীনে মালদ্বীপে দুই ধরনের নির্বাচন কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে, যার একটি হলো তাদের সংবিধানের ২৭৬ অনুচ্ছেদের অধীন 'ট্রানজিশন পিরিয়ড' বা অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য নির্বাচন কমিশন, আরেকটি হল সংবিধানের ২৯৬ অনুচ্ছেদের অধীনে পাঁচ বছর মেয়াদের দীর্ঘ মেয়াদী নির্বাচন কমিশন। অন্তবর্তীকালীন সময়ের নির্বাচন কমিশন গঠিত হয় মূলত নির্বাচনকালীন সময়ের জন্য এবং এটির মেয়াদ থাকে দীর্ঘ মেয়াদী কমিশন গঠন পর্যন্ত। উভয় ক্ষেত্রেই কমিশন হয় পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট এবং কমিশনের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে প্রেসিডেন্ট ও আরেকজনকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেন। এছাড়াও উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় নাম সংসদে প্রেরণ করেন। রাষ্ট্রপতি চূড়ান্ত নিয়োগ দেন তার প্রেরিত নাম থেকে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ট ভোটে অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে। আইন অনুযায়ী, দীর্ঘ মেয়াদী নির্বাচন কমিশনের ক্ষেত্রে জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত নাম থেকেই প্রয়োজনীয় নাম অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতি সংসদে প্রেরণ করেন এবং সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরুর ৬০ দিনের মধ্যে কমিশনের প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ সম্পন্ন করতে হয়। কমিশনে নিয়োগের ন্যূনতম বয়স ২৫ বছর এবং সংসদ নির্বাচন কমিশনকে দ্বিতীয় বারের জন্য পূনঃনিয়োগ দিতে পারে।

আফগানিস্তান: আফগানিস্তানেও একটি আইনের অধীনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদান করে থাকেন। সংসদের উভয় কক্ষের স্পিকার, প্রধান বিচারপতি, সংবিধানের নিরীক্ষণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত স্বাধীন কমিশনের চেয়ারপার্সন, আফগানিস্তানের স্বাধীন মনবাধিকার কমিশন, নির্বাচন বিষয়ে অভিজ্ঞ সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি সমন্নয়ে গঠিত একটি কমিটির তৈরি তালিকা থেকে রাষ্ট্রপতি এ নিয়োগ দিয়ে থাকেন।

হুদা কমিশনের প্রস্তাবিত আইন

বিদায়ের পূর্বে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগের লক্ষ্যে আইনের একটি খসড়া রেখে যাওয়াটি ছিল হুদা কমিশনের পক্ষ থেকে একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। প্রস্তাবিত আইনে অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দেওয়ার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে আহবায়ক করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতি, দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান, সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান এবং মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে নিয়ে এই অনুসন্ধান কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়। অনুসন্ধান কমিটির দায়িত্ব হবে প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে তিনজনের একটি প্যানেল তৈরি করা।

খসড়া আইন অনুযায়ী, অনুসন্ধান কমিটি প্রস্তাবিত প্যানেলটি প্রধানমন্ত্রীর অফিসের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের কার্য উপদেষ্টা কমিটির কাছে প্রেরণ করবে, যার দায়িত্ব হবে এটিকে চূড়ান্ত করা। রাষ্ট্রপতি এই চূড়ান্ত প্যানেল থেকে নিয়োগ দান করবেন। প্রসঙ্গত, জাতীয় সংসদের স্পিকারের নেতৃত্বে গঠিত সংসদের কার্য উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হলেন প্রধানমন্ত্রী, সংসদের বিরোধী দলের নেতাসহ ১৫ জন জেষ্ঠ্য সংসদ সদস্য।

প্রস্তাবিত আইনে কোন কোন অযোগ্যতার ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার হতে পারবেন না তা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এতে অসৎ বলে বিবেচিত এবং বৈধ আয় বহির্ভূত জীবন যাপনকারী, রাজনৈতিক দলের বা তার অঙ্গ সংগঠনের সদস্য, সংসদ নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী ও ঋণ খেলাপীকে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগের অযোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত আইনে অনুসন্ধান কমিটিকে তার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে কমিশনের সচিবালয়কে কমিটির অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সাচিবিক দায়িত্ব পালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

অনুসন্ধান কমিটির বিধান এবং অযোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করে দেওয়া নিঃসন্দেহে প্রস্তাবিত আইনটির ইতিবাচক দিক। সংসদের কার্য নির্বাহী কমিটিকে নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যুক্ত করাও নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। তবে আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় সংসদের কার্য নির্বাহী কমিটির সম্পৃক্ততা নির্বাচন কমিশনে নিয়োগে নিরপেক্ষতার সমস্যা সমাধান করবে বলে মনে হয় না।

আমরা মনে করি প্রস্তাবিত আইনে মোটা দাগে চারটি বিধান থাকা আবশ্যক। প্রথম বিধানটি হওয়া উচিত নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত। কমিশনের ওপর অর্পিত দায়িত্ব হওয়া উচিত সততা, স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে সকল নির্বাচন পরিচালনা করা। আরও সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে কমিশনের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত, সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান, সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান, সংসদীয় এলাকার সীমনা নির্ধারণ এবং রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ। নির্বাচনী ট্রাইবুনাল গঠন ও নির্বাচনী বিরোধের মীমাংসাকরণও কমিশনের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের নির্বাচন কমিশনের একটি স্বাধীন সচিবালয় রয়েছে। আমরা কমিশনের জেষ্ঠ্য কর্মকর্তাদেরকে সরাসরিভাবে অথবা প্রেষণে নিয়োগ প্রদানের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত করার পক্ষে।

দ্বিতীয় বিধানটি হওয়া উচিত প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ। হুদা কমিশনের প্রস্তাবিত অযোগ্যতার মানদন্ডও আরও শাণিত করা যেতে পারে। কমিশনে নিয়োগের ন্যূনতম বয়স ৪৫ করা যেতে পারে এবং বয়সের উর্ধসীমা না রাখাই শ্রেয় হবে বলে মনে হয়।

প্রস্তাবিত আইনে মোটা দাগের তৃতীয় বিধান হওয়া উচিত অনুসন্ধান কমিটি সম্পর্কিত। আমরা সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির পরিবর্তে প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের অনুসন্ধান কমিটিতে রাখার পক্ষে। সুস্পষ্টভাবে আমরা প্রধান বিচারপতি মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে অন্তত দুইবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন এমন দুটি দল থেকে দুজন প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের একজন প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমের একজন প্রতিনিধি সমন্নয়ে পাঁচজনের একটি অনুসন্ধান কমিটির প্রস্তাব করছি। তবে নিশ্চিত করতে হবে যে, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে দলীয় আনুগত্যের বিশ্বাসযোগ্য কোনো অভিযোগ যেন না থাকে।

অনুসন্ধান কমিটির প্রাথমিক দায়িত্ব হবে একজন ব্যক্তির নাম প্রধানমন্ত্রীর কছে প্রেরণ করা, যাকে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করবেন। পরবর্তীতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অনুসন্ধান কমিটির সম্মিলিত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে অন্যান্য নির্বাচন কমিশনাদেরকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করবেন। কমিশনের কাজে ধারাবাহিকতা রক্ষার লক্ষ্যে আগামী মেয়াদের পর সবচেয়ে জেষ্ঠ্য নির্বাচন কমিশনারকে আমরা প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব করি। এছাড়াও আমরা প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ পাঁচজনের পরিবর্তে তিনজনকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠনের পক্ষে। কারণ পাঁচজনের পরিবর্তে তিনজনকে নিয়ে গঠিত কমিশনের পক্ষে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে কাজ করা সহজ হবে বলে আমরা মনে করি।

প্রস্তাবিত আইনের আরেকটি বিধান হওয়া উচিত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে, যাতে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। আমরা অনুসন্ধান কমিটির পক্ষে নাগরিকদের কাছ থেকে কমিশনে নিয়োগ দেওয়ার লক্ষ্যে নাম আহবানের প্রস্তাব করি। প্রাপ্ত নামগুলো থেকে আইনে নির্ধারিত যোগ্যতার আলোকে অনুসন্ধান কমিটি একটি শর্ট লিস্ট তৈরি করবে, যা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে, শর্ট লিস্টে থাকা ব্যক্তিদের অনুমতি সাপেক্ষে, জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হবে। শর্ট লিস্টে থাকা ব্যক্তিদের সম্পর্কে অনুসন্ধান কমিটি গণশুনানির আয়োজন করবে, যার ভিত্তিতে কমিটি নির্ধারিত পদের বিপরীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নাম প্রধানমন্ত্রীর দফতরে প্রেরণ করবে, যাদেরকে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কমিশনে নিয়োগ প্রদান করবেন। অনুসন্ধান কমিটি তার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা একটি প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করে তা জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করবে।

পরিশেষে, আমরা আনন্দিত যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ বিতর্ক এড়াতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বর্তমানে সংলাপ করছেন। এপর্যন্ত তিনি ২৩টি দলের সঙ্গে সংলাপে বসেছেন, যা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। তবে আমরা মনে করি যে, কমিশনে নিয়োগের ইস্যুটি একটি সার্বজনীন বিষয় এবং এটি সকল নাগরিকের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। এই ইস্যুতে সকল নাগরিকই অংশীজন, কারণ কমিশনে নিয়োগ সঠিক না হলে সকল নাগরিকই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাই আমরা রাষ্ট্রপতিকে তাঁর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার আগে বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে সংলাপ করার বিনীত অনুরাধ করি। একইসঙ্গে আমরা তাঁকে অনুরোধ করি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশরারদের নিয়োগের জন্য একটি যুগোপযুগি আইন করার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়ার।